ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের বিষয়ে আমরা এরই মাঝে একটি কর্মসূচি নিয়েছি। সেই সময় থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় আমরা অতিক্রম করে ফেলেছি। এখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপার হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির প্রাপ্তি মূল্যায়ন করা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার পথ নির্দেশনা পাওয়া।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা : শুরুতেই স্পষ্ট করা দরকার, আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমরা কী বুঝিয়েছি। স্বল্প কথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার স্বপ্ন। আমাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুসারে সেটি হচ্ছে মাথাপিছু আয় দুই হাজার মার্কিন ডলারে পৌঁছানো। আমরা এরই মাঝে এটিও স্পষ্ট করেছি, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাও এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এটি ২০০৩ সালে জেনেভায় প্রদত্ত বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি সমাজ সম্মেলনের ঘোষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দুনিয়ার সব দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের মতোই এর মূল্য লক্ষ্য হলো একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো হলো ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ ভারতে টেলিগ্রাফ বোর্ড চালু, ১৯৩৯ সালে রেডিও স্টেশন স্থাপন, ১৯৬২ সালে পাকিস্তান টেলিগ্রাফ বোর্ড গঠন, ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে কমপিউটারের আসা ও ঢাকায় টিভিকেন্দ্র স্থাপন, ১৯৮৭ সালে কমপিউটারে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ, ১৯৯৬ সালে অনলাইন ইন্টারনেট চালু ও নবম-দশম শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা বিষয়টি পাঠ্য করা, ১৯৯৭ সালে মোবাইলের মনোপলি ভাঙা, ১৯৯৮ সালে কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার, ২০০৬ সালে প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপন, ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মসূচি নেয়া এবং ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-রূপরেখা : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে, তাতে ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২০০৭ সাল থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। তাতে এর রূপরেখা অনেকটাই বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু কয়েকটি কর্মসূচির কথা উল্লেখ করছি।

জনগণের রাষ্ট্র : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশাটি ছিল বাংলাদেশ একটি জনগণের রাষ্ট্র হবে, যাকে সত্যিকারের প্রজাতন্ত্র বলা হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিই হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে না। রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রভাষা এবং বাঙালি জাতির জাতিসত্তা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে সংবিধানে বর্ণিত সব সুযোগ-সুবিধা সমভাবে দান করবে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে।

আমরা স্বপ্ন দেখি, এই সময়ের শেষে পুরো দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে কোনো মানুষ বসবাস করবে না। রাষ্ট্রের সব নাগরিক অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সব মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারবে। সমাজে আর্থিক ও অন্য সব ধরনের বৈষম্য বিলীন হয়ে যাবে এবং সুশাসন নিশ্চিত হবে-দুর্নীতি বলতে কিছু থাকবে না। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী বিষয়াদিসহ সব কিছুতেই জনগণের কর্তৃত্ব ও অংশগ্রহণ থাকবে। এটি ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া লুটপাটের ক্ষেত্র হবে না।

ডিজিটাল সরকার : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বাধীন ও সার্বভৌম সংস্থা। এটি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সংসদের

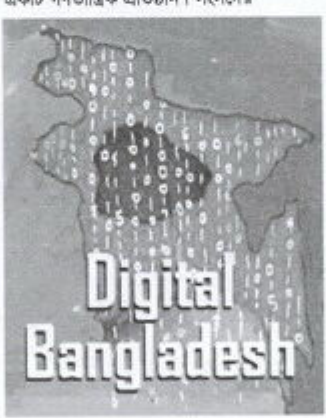

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাষ্ট্র পরিচালনা করে। আমরা স্বপ্ন দেখি, জাতীয় সংসদই হবে রাষ্ট্রের সব কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে সংসদের সব কার্যক্রমসহ সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ডিজিটাল হবে। নির্ধারিত সময়ের নির্বাচনে ডিজিটাল পদ্ধতির পরিপূর্ণ ব্যবহারসহ নির্বাচনপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংসদসহ সব নির্বাচনকেন্দ্রিক সংস্থায় জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে তার মতামত জানাতে পারবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে ও নির্বাচনের বাইরেও জনমতের প্রতিফলন ঘটানো যাবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে আমাদের স্বপ্ন হলো : ডিজিটাল বাংলাদেশের সরকার হবে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটাল। সেটি হবে দক্ষ ও জনগণের সেবক। সরকারের সব তথ্য নাগরিকেরা যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে ডিজিটাল যন্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারবে। বিচার হোক আর সরকারের কাছে কোনো আবেদন করা হোক বা আবেদনের ফলাফল জানা হোক, কোনো তথ্য পাওয়া হোক বা দেওয়া হোক, কমপিউটার বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ডিজিটাল যন্ত্রে ডিজিটাল উপায়ে নাগরিকেরা সরকারের কাছে পৌঁছাতে পারবে। কাউকে সশরীরে সরকারি অফিসে আসতে হবে না। সরকার যাবে জনগণের কাছে। ফাইলে বন্দি থাকবে না কোনো তথ্য। সরকারের সব তথ্য থাকবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত। স্থানীয় সরকারসহ সরকারের সব স্তরের সব নাগরিক সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দক্ষতার সাথে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো হবে। সরকারের কাজ করার পদ্ধতিতে কোনো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকবে না। কোনো স্তরে কোনো ধরনের দুর্নীতি থাকবে না। দেশের প্রশাসন, শিক্ষা, ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি নিবন্ধন, যাতায়াত, যোগাযোগ ও পরিবহন, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদিসহ সব কর্মকাণ্ড ডিজিটাল হবে।

ডিজিটাল জীবনধারা : দেশের সংসদ, সরকার ও জীবনযাপনের সব ব্যবস্থা ডিজিটাল হওয়ার ফলে দেশের মানুষ একটি ডিজিটাল জীবনধারায় বসবাস করবে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিকতা, রাজনীতি, জীবনযাপনসহ সামগ্রিক জীবনধারা ডিজিটাল পদ্ধতির হবে।

সর্বজনীন সংযুক্তি : পুরো দেশটির প্রতি ইঞ্চি মাটি যেকোনো ধরনের তার বা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগে যুক্ত থাকবে। বিশ্বের সব দেশের সব প্রান্তের সাথে বিরাজ করবে সেই সংযুক্তি। এই সংযুক্তিতে যুক্ত থাকা দেশের সব নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য হবে। এই অধিকার থেকে কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-অগ্রগতি : ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে সরকার এরই মাঝে তিন বছরের বেশি সময় পার করেছে। খুব সাধারণভাবে হয়তো অনেকের কাছেই এটি দৃশ্যমান হবে না, এই সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে আমরা কতটা পথ এগিয়েছি। অনেকেই হয়তো বলবেন, ২০০৮ সালে যে জীবন ছিল জীবন তো এখনও ▸

তেমনই মনে হচ্ছে। তবে একটু গভীরভাবে যদি দেখা যায় তবে অনুভব করা যাবে, পরিবর্তনটা ব্যাপক এবং এই সামান্য সময়ের মাঝে যতটা পথ আমরা পার হয়েছি সেটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এই অগ্রগতির খাতগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখতে চাই।

জনগণের রাষ্ট্র গড়ার পথে : বিগত তিন বছরে দেশটিকে জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয়টি ছিল দেশের সংবিধানকে তার শেকড়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। এই সময়ে বারবার কাঁটাছেড়া করা সংবিধানের সংশোধন, সার্বিক দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক একটি সরকার পরিচালনা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করাসহ নানাভাবে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। গণমাধ্যম, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক মহলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশভাবে বজায় রাখার একটি ঐতিহাসিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এই সময়ে। ইভিএম ও ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করে নির্বাচনকে ডিজিটাল করার সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এই সময়ে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত সেবাগুলোর সম্প্রসারণ করে ডিজিটাল যুগের সূচনা করায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রায় ৭ শতাংশের কাছাকাছি উন্নীত করা, ৪ লাখ চাকরি দান ও ৬৮ লাখ কর্মসংস্থানসহ নানা পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন করে নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়েছে। একটি সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত সোনার বাংলা গড়ে তোলার এই প্রয়াসকে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল সময় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আমরা এটুকু প্রত্যাশা করি, এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০২১ সালে আমরা সত্যি সত্যি একটি স্বপ্নের বাংলাদেশে বসবাস করব।

ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার সিঁড়িতে : প্রচলিত সরকার কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল রূপান্তর করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের মতো দেশে নানা কারণে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপাদান থাকে যা ডিজিটাল পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক। তার মাঝে সংসদকে ডিজিটাল করা, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড ডিজিটাল হওয়া এবং সরকারের কাজ করার পদ্ধতি ডিজিটাল করা একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এজন্য বিগত সময়ে কিছুটা কার্যকর অগ্রগতি হয়েছে।

সংসদের কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল না হলেও বিগত তিন বছরে বাজেট পেশ থেকে শুরু করে, সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়কে ডিজিটাল করার প্রক্রিয়ার বিকাশ দেখা গেছে এই সময়ে। এই প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন করা হলে একটি জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনায় সংসদের ভূমিকা সম্পূর্ণ হবে। দেশের নাগরিকেরা দেশ পরিচালনার সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে এবং দেশের পরিচালকেরা নির্বাচন ছাড়াও জনমতের প্রতিফলন দেখতে পাবেন। সংসদ সদস্য ও রাজনীতিকদের সাথে নাগরিকদের ইন্টারেকশন এরই মাঝে শুরু হয়েছে। অনেক সংসদ সদস্য নিজেদের ওয়েব পেজ বা ফেসবুক পেজ তৈরি করে নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় করছেন। তাদের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট রয়েছে যাতে জনগণ তাদের মতামত পাঠাতে পারেন। দিনে দিনে রাজনৈতিক দলগুলো ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রাজনীতি চর্চা করতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক দলগুলোর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল তাদের অনুষ্ঠান, সমাবেশ, জনসভা ইত্যাদি এমনকি ইন্টারনেটে অনলাইন সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করছে। এই সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করা। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে এর সফল ব্যবহারের পর ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হলে সেটি প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় একটি মাইলফলক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রধানমন্ত্রী ও দেশবাসী কামনা করেন, সামনের জাতীয় নির্বাচনেও এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হবে। ইতোমধ্যেই প্রবাসীদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগত জাতীয় নির্বাচনের আগেই ছবিসহ ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল এবং সেই ডিজিটাল ভোটার তালিকা ও তার আপডেটের ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই তালিকার বিদ্যমান ডিজিটাল তথ্য নাগরিকদের পরিচয় নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন সেবা দানের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে জাতীয় পরিচয়পত্র দানের প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ডিজিটাল পাসপোর্ট বা মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট দান করার কাজটি এখন শুধু সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে না, বরং দেশে-বিদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। ভিসা দানের বিষয়টিকেও ডিজিটাল করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সরকারের কাজকর্মের দিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কতগুলো খাতে গত তিন বছরে যেসব প্রবৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয়েছে তার একটি ছোট তালিকা নিচে প্রদান করছি।

আইন ও নীতি প্রসঙ্গ : সরকার এরই মাঝে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রথমে বিভাগ ও পরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মাঝেই প্রণয়ন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯। এমনকি এই নীতিমালাটিকে সংশোধন ও নবায়ন করার কাজটিও সম্পন্ন করা হয়েছে ২০১১ সালে। এটি এখন শুধু নবায়নের অপেক্ষায়। এই প্রথমবারের মতো এই নীতিমালায় কর্মপরিকল্পনা যুক্ত করা হয়েছে। আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬-এর সংশোধন করা হয়েছে ২০০৯ সালে। সেই সংশোধনী দেশে একটি ডিজিটাল সিগনেচার কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে। এরই মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গঠন করে তার মূল কমিটির দুটি সভা ও নির্বাহী কমিটির বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোবাইলের টুজির লাইসেন্স নবায়ন, কলসেন্টার লাইসেন্স ইস্যু করা, ইন্টারনেট গেটওয়ে ও ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি ও লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি থ্রিজি/ফোরজি লাইসেন্স ইস্যুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে অচিরেই দেশে মোবাইলের থ্রিজি/ফোরজি সেবা চালু হবে। এরই মাঝে ওয়াইম্যাক্স সেবার গাইডলাইন অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের আওতায় দুটি প্রতিষ্ঠান দেশে ওয়াইম্যাক্স সেবার সম্প্রসারণ করেছে। ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়ে ই-কমার্স ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় চেক ক্লিয়ারেন্সসহ অনলাইন ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। বাংলা প্রমিতকরণ, উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য গঠিত একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। বিডিএস ১৫২০:২০১১ নামে বাংলা এনকোডিং প্রমিত করা হয়েছে। বিডিএস ১৮৩৪:২০১১ নামে মোবাইল কিপ্যাড প্রমিত করা হয়েছে। এই প্রমিত কিবোর্ড অনুসারে মোবাইল ফোনের বাংলা কিবোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইন্টারনেটের বাংলা ডোমেইন নেম অনুমোদিত হয়েছে। অন্যদিকে ১৮ এপ্রিল ১২ থেকে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের যুগ শুরু হয়েছে। সচিবালয় নির্দেশিকা ২০০৮ অনুসারে ই-মেইল সরকারি কাজে ব্যবহার শুরু হয়েছে। সব সরকারি কলেজে ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন : ডিজিটাল বাংলাদেশের অবকাঠামো হিসেবে আমরা যদি টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোর কথা ভাবি তবে দেখা যাবে, এই সময়ে এসব খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারাটি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইন্টারনেটের প্রধান বাহন ব্যান্ডউইডথের প্রসার ঘটানো ছাড়াও এর দাম ২৭ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৮ সালের ৪৪.৪ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ এখন ১৪৪.৬ গিগাবাইট হয়েছে। এটি খুব সহসাই ১৬০ গিগাবাইট এবং অদূর ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি বাড়ানোর পাশাপাশি বিকল্প আন্তর্জাতিক সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কাজ শুরু হয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মতো স্থাপন করা হয়েছে জাতীয় ডাটা সেন্টার। এটিই প্রথম থ্রি টায়ার সনদপ্রাপ্ত ডাটা সেন্টার, যাতে সরকারের সব ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ করা যাবে। দেশের ভেতরে একাধিক নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা নেটওয়ার্ক নামে সরকার ৬৭৫ কোটি টাকার একটি নেটওয়ার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এটি উচ্চশিক্ষার ডিজিটাল যুগের বাহন হতে পারে। সরকার বাংলা গভ. নেটওয়ার্ক প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। ইনফোবাহন নামের আরেকটি নেটওয়ার্ক প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করছে। এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরকারের সব অংশ ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের আওতায় ▸

আসবে। ঢাকার জনতা টাওয়ারে এসটিপি চালুর কাজ হচ্ছে। এই বছরেই এটি চালু হতে পারে। কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কের কাজ এগিয়েছে। আগামী বছরের মাঝে সেটিও চালু হতে পারে। এ ছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো : বাংলাদেশের জন্য এটি এক সৌভাগ্যবান অর্জন, আমরা এখন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা দান করার ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ। ২০০৯ সাল থেকে এই সেবা খাতের এমন বিকাশ ঘটেছে, আমরা এজন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মাননা পেয়েছি ও পুরস্কৃত হয়েছি। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের এ ধরনের অর্জন মাইলফলক হিসেবেই গণ্য হতে পারে।

২০০৯ সালের পর সরকার জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছে। বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করাটা সেই সফলতারই বহিঃপ্রকাশ। সরকার একদিকে কৃষকের পুর্জিকে ডিজিটাল করেছে, অন্যদিকে কৃষিতথ্য, স্বাস্থ্যতথ্য, শিক্ষাতথ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য সেবা ইউনিয়ন ও ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। দেশের ৪৫৯৮টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র চালু হয়েছে। এই সেবাকেন্দ্রগুলো একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলছে। বিশ্বের কোনো দেশ একসাথে এতটা তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটির সেবা পৌঁছানোর সাহস করেনি। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকার আইসিটি সামগ্রীর জোগান দিয়েছে এবং ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলাকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছে। গড়ে ৪ জন হিসেবে এই খাতে প্রায় ১৮ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এদের কেউ কেউ শুধু দেশের ভেতরের সেবাই দান করছে না–বাইরের দেশের আউটসোর্সিংয়ের কাজও করছে। এরই মাঝে সব জেলায় তৈরি হয়েছে জেলা তথ্য বাতায়ন ও জেলা ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র। ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র থেকে কোনো ধরনের কালক্ষেপণ ও হয়রানি ছাড়া দান করা হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত সেবা। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমপিউটার দেয়া ছাড়াও গড়ে তোলা হয়েছে তথ্যভাণ্ডার। ৮০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। পোস্ট অফিসগুলোকেও ডিজিটাল সেবাদান কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

সরকার আগামী জুলাই মাস থেকে বিদ্যমান ভূমি রেকর্ড ডিজিটাল করার কাজ শুরু করছে। একই সাথে চলতি বছরেই কোরিয়ার সহায়তায় ডিজিটাল ভূমি জরিপের কাজ শুরু হচ্ছে। ভূমি নিবন্ধন ডিজিটাল করার বিষয়েও কাজ শুরু হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকেই এসএসসির ফলাফল মোবাইল এবং ইন্টারনেটে দেয়া ছাড়াও ই-মেইলে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ফোন বিল মোবাইলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেলের সময়সূচি মোবাইলে জানা যায়। রেলের টিকেটও মোবাইলে কেনা যায়। ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। ব্যাংকিং সেবা সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল হয়েছে। একই সাথে ব্যাংকের চেক ক্লিয়ারেন্স ডিজিটাল হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়ের কাজ করছে। ব্যাংকের ক্রেডিট রিপোর্ট অনলাইন হয়েছে।

সরকারের হাতে শিক্ষার ডিজিটাল যাত্রার সবচেয়ে বড় যে প্রকল্পটি এখন রয়েছে সেটি হলো : ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর দান করে স্মার্ট ক্লাসরুম গড়ে তোলা। ৩ হাজার ৫৬ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি এখন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এরই মাঝে সরকার এই ধারণার প্রাথমিক প্রয়োগের কাজটি শুরু করেছে। দেশের সর্বত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ইন্টারেকটিভ ও ডিজিটাল শিক্ষা কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকেরা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করছেন এবং সেসব তথ্যাবলি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্লাসরুম ডিজিটাল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

জীবনধারা হচ্ছে একটি জাতি-গোষ্ঠীর সার্বিক জীবনধারাকে ডিজিটাল রূপান্তরের মাঝে নিয়ে যাওয়া। ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলার মানেই হচ্ছে সেই জীবনধারা গড়ে তোলা। আমাদের দেশের মানুষের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস বেশ দ্রুতগতিতে পৌঁছাচ্ছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর হাতে মোবাইল ফোন আছে। আছে ইন্টারনেট এবং আরও ডিজিটাল প্রযুক্তি। এখন মানুষ যে পরিমাণ কাগজে যোগাযোগ করে তারচেয়ে অনেক বেশি যোগাযোগ করে ইন্টারনেটে।

সর্বজনীন সংযুক্তির প্রসার : দেশে এখন চতুর্থ প্রজন্মের ইন্টারনেট সেবা বা ওয়াইম্যাক্স রয়েছে। অন্তত দুটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, বিভাগীয় শহর ও কোনো কোনো জেলা শহরে এই সেবাদান করছে। মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। প্রায় তিন কোটি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তবে এই হার আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে যখন আমরা থ্রিজি বা ফোরজি মোবাইলের যুগে পৌঁছব। আশা করা হচ্ছে, এই বছরের মাঝেই থ্রিজি চালু হবে এবং লাইসেন্সও দেয়া হবে।

আইসিটিতে বাংলাদেশের অবস্থান

খাত	ডিসেম্বর ২০০৮	ফেব্রুয়ারি ২০১২
মোবাইল সংযোগ	৪.৪৬ কোটি (২৫ ভাগ)	৮.৭৯ কোটি (৫৩ ভাগ)
বার্ষিক কমপিউটার বিক্রি	১.৮০ লাখ	৬.০ লাখ
বার্ষিক ল্যাপটপ বিক্রি	৪২ হাজার	৫.০ লাখ
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	৬০ লাখ (৩ ভাগ)	৩.১১ কোটি (১৮ ভাগ)
ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার	৮ গিগাবাইট	৮৫ গিগাবাইট
ওভেস্কে অবস্থান	অনুল্লেখ্য	তৃতীয়
আইসিটি সেবা	অনুল্লেখ্য	দ্বিতীয়
আউটসোর্সিং ৩০ দেশে	নেই	দৃঢ় অবস্থান

সরকার ২০১২ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ২০১৩ সালে ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ঢাকার কাছে গাজীপুরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শাহজালাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত পর্যায়ের ওয়াইম্যাক্স চালু করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকেই এনসিটিবির সব পাঠ্যপুস্তক ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার পাশাপাশি ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ই-তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের সহায়ক হয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি : এ বিষয়ে সবাই একমত, ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাটি নিজেই একটি বড় ধরনের অর্জন ও বিরাট রকমের সচেতনতা কর্মসূচি। আমরা মনে করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাটিই হচ্ছে একটি বড় অর্জন। এর ফলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। আমরা লক্ষ করেছি, এই সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কাজ হয়েছে।

ডিজিটাল জীবনধারার সূচনা : বাংলাদেশের মানুষ এরই মাঝে একটি ডিজিটাল যুগের বাসিন্দা হওয়ার স্বাদ নিতে শুরু করেছে। ডিজিটাল

কর্মপরিকল্পনা : সার্বিকভাবে বারো বছর মেয়াদি একটি মহাযজ্ঞের সূচনা হিসেবে ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে শুধু প্রকৃষ্ট বললেই যথেষ্ট বলা হবে না–বরং এই সময়ের মাঝে একটি সভ্যতার রূপান্তরের জন্য প্রাথমিক ভিত রচনায় পাওয়া গেছে অভাবনীয় সফলতা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে–এই সফলতা কি ধরে রাখা যাবে? প্রথমত, এই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আগামী দিনের পরিকল্পনাগুলো কি সঠিক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, একটি শঙ্কা সবার মাঝেই কাজ করছে–আগামীতে যদি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় না আসতে পারে তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির কি হবে।

অন্যদিকে একটি দুর্বলতার কথা স্পষ্ট করে বলা উচিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিকে রাজনৈতিকভাবে যতটা সম্প্রসারিত করা উচিত ছিল সেটি তেমনভাবে করা হয়নি। এজন্য রাজনৈতিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি, এর ধারণা, কাজের গতি, পরিকল্পনা ও নীতিমালাগুলো রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হিসেবে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com